উনিশশতকের প্রতিবাদী বাংলা নাটকের উত্তরাধিকার এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

।। এক।।

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

বিজন ভট্টাচার্য রচিত, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রযোজিত 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হল। শম্ভু মিত্র বিজন ভট্টাচার্য জুটি বহু দক্ষশিল্পীকে সমবেত করে নাটকের প্রথম অভিনয়েই একেবারে তোলপাড় ফেলে দিল। মানুষের মন জয় করল। 'এমন বিষয়, এমন অভিনয়, এমন প্রকরণ আগে আর দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে এক বিপ্লব। বিপ্লবই বটে। তখন থেকে নাট্যাভিনয় ব্যাপারটার মানেই যেন লোকের কাছে বদলে গেলে।' [অরুণ মিত্র - 'নবান্ন স্মৃতি'] 'শুধু বাংলা দেশেই নয়, 'নবান্ন' সাড়া জাগাল সমগ্র ভারতবর্ষে।' [বিজন ভট্টাচার্য —'নবান্ন' -এর নাট্যকারের প্রতিবেদন]

'নবান্ন' নাটকের এই প্রবল সাফল্যে এবং অভিনবত্বের অন্তহীন আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যা উনিশশতকের বাংলা নাটকের উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকারের প্রতি অনাদর এবং ইতিহাসগতভাবে অবিচারের পরিচায়ক। চিত্তরঞ্জন ঘোষ 'নাটক নবান্ন' লেখায় মন্তব্য করেছেন - জনঘনিষ্ঠ নাটক লেখা মধ্যবিত্ত নাট্যকারদের পক্ষে কঠিন। নবান্ন এই জাতীয় নাটক লেখার রাস্তাটা দেখিয়েছে। রঙ্গীন হালদার 'জবানবন্দী' প্রসঙ্গে আলোচনায় বিজনবাবুর নাটকেই প্রথম দেখেছেন 'বাংলা নাট্যকলা বাঙালি জীবনের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে।' 'নট নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য — একটি আলেখ্য' —এ লেখা হয়েছে 'নবান্ন মঞ্চায়নের মাধ্যমে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ভারতবর্ষে বাস্তববাদী নাট্যপ্রযোজনার পথ প্রদর্শকের গৌরব অর্জন করে।'

এসব কথার মধ্যে ইতিহাসগতভাবে অনবধানতা রয়েছে। উনিশশতকের সমাজসচেতন প্রতিবাদী নাটকই যে - নবান্নের এবং বিশশতকের বাস্তববাদী নাটকের আবির্ভাবের জমি তৈরি করে দিয়েছে, উত্তরাধিকারের এই সহযোগিতার অস্বীকৃতি রয়েছে এই সব মন্তব্যের মধ্যে। সেদিনের প্রতিবাদী নাট্যকারগণই প্রথম বাঙালি সংসারজীবনের যন্ত্রণা, বুকফাটা কান্না, মনোবাসনা, গ্রামবাংলার কৃষকজীবনের দুর্দশা শোষণপীড়ন ক্ষোভ, সক্রিয় প্রতিরোধ নাটকে মূর্ত করেছেন। এসব নাটককে সেদিন বাংলা থিয়েটার দুঃসাহসের সঙ্গে রক্তচক্ষু বাধার মধ্যে মঞ্চস্থ করে বাস্তববাদী নাটক প্রযোজনার পথপ্রদর্শকের গৌরব অর্জন করেছে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'বিধবা বিবাহ', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'নীলদর্পণ' 'জমিদার দর্পণ', 'চা - কর দর্পণ', 'শরৎসরোজিনী', 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' —নাটকে তারই তর্কাতীত পরিচয়। এমনকি ইংরেজ শাসনে দুর্ভিক্ষ এবং তার কারণে সৃষ্ট অনটন - অনশন - রোগশোক - লঙ্গরখানার বাস্তবদুর্গতিকেও নাটকের উপজীব্য করে যদুনাথ তর্করত্ন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লেখেন 'দুর্ভিক্ষ দমন নাটক'। নারীজাতির ওপর সামন্ত ব্যবস্থার মর্মভেদী নিষ্ঠুরতা, কৃষক মজুরের ওপর নীলকর, দেশি ভূস্বামী, চা বাগান মালিকের শোষণপীড়ন, ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বর্বর মারগুলি, ইংরেজিশিক্ষিত একশ্রেণির নব্য তরুণদের লাম্পট্য, মদ্যপানাসক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা, একশ্রেণির ভণ্ড কপটাচারী কুচরিত্র নারীদেহেলোলুপ হিন্দু সমাজপতিদের ব্যভিচার — এসবকে মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে অসমসাহসে নগ্ন করে লোকচক্ষে তুলে ধরার কর্তব্য এবং তার নিরসনের আর্তি বোধ করেছেন সেদিন নাট্যকারগণ। এসবের বিরুদ্ধে সেদিন যে আন্দোলন জাগরণ সংঘটিত হচ্ছিল তার পাশে সাহিত্যিক মিত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে তাঁরা নাটকের মাধ্যমে জনমত গঠনে নেমেছেন। প্রতিবাদ প্রতিরোধে মানুষকে উদ্দীপিত করেছেন। সমাজআন্দোলন থেকে জন্ম নিয়ে প্রতিবাদী নাটকগুলি সমাজআন্দোলনকেই বল দান করেছে। আন্দোলন ও নাটক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে। নাটককে যুগমানসের ইচ্ছাপূরণের ও সমাজরূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের পথপ্রদর্শক উনিশ শতকের প্রতিবাদী নাট্যকারগণ। বাংলা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্মী নাটকের বর্ণপরিচয় তাঁরাই রচনা করেছেন। উনিশশতকে বাংলা নাটকের এই যে সমাজসচেতন প্রতিবাদী চরিত্রবৈশিষ্ট্য বা বিজ্ঞানের ভাষায় 'জিন (gene) তৈরি হয়েছিল, এই প্রতিবাদী 'জিন' বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎঅভিমুখ রচনা করে দিয়েছে। শক্তি জুগিয়েছে যুগ ও সময়ের বদলের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবনউদ্ভূত নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, সমস্যা, সময়ের জটিলতা, সংঘাত আন্দোলন, মাটির বাসনার মুখোমুখি হবার— মানুষের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে, সমাজরূপান্তরের দিকে নাটকের অভিমুখকে অবিচলিত রাখার। বাংলা থিয়েটারে পালা বদল যতই ঘটুক, থিয়েটারের চিন্তাভাবনায় মৌলিক পরিবর্তন যতই আসুক, যতই ব্যতিক্রমী হোক নাট্যসৃষ্টি —এই নিয়ন্ত্রক উপাদান বা জিনকে উপেক্ষা করে বাংলা নাটক সমাদৃত হতে পারেনি। বাংলার বিভিন্ন যুগের বাঁধামঞ্চের সফল নাটক, গণনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার, পথ নাটিকা, বিভিন্ন নাট্যসংস্থার আদৃত প্রযোজনা - সর্বত্র এই পক্ষাবলম্বনের ও সমাজসচেতন প্রতিবাদমানসিকতার উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞান। রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, মন্মথ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ প্রধান প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব এবং বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান নাট্যকার পরিচালকগণ কেউ -ই নাটকের বংশানুগতির নিয়ন্ত্রক এই উপাদানকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বাংলা নাটকের এই 'জিন'কে যাঁরাই ছোটো করে দেখতে চেয়েছেন, ঠাট্টা করতে চেয়েছেন, শিল্পীর নিরপেক্ষতা ও আন্দোলনবিমুখতা থেকে একে অগ্রাহ্য ক'রে একটা নতুন 'মডেল' অনুসরণ করে নতুন থিয়েটার করতে গিয়েছেন, তাঁরাই শক্তিহীন হয়ে সরে গিয়েছেন। ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকারের প্রবাহ ধরেই এসেছে 'নবান্ন' নাটক। উনিশশতকের নাট্যকারগণ সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংক্ষুব্ধ আবর্ত থেকে উপজীব্য সংগ্রহ করে নাটক হাতে মানুষের পাশে দাঁড়াবার যে কর্তব্যকর্ম বোধ করেছেন, অনুরূপটাই বোধ করেছেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'দেবীগর্জন' ইত্যাদি নাটকে। বিশ শতকের চারের শতকের মহামন্বন্তর আর ৪২ -এর দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ গণ অভ্যুত্থান -এর মর্মভেদী সমাজবাস্তবতা থেকে উপজীব্য সংগ্রহ করে নাটকের মাধ্যমে দেশের ও দশের কথা সাধারণ্যে প্রচার করবার কর্তব্যকর্মের কথা বিজনবাবু নিজেই শুনিয়েছেন 'নবান্ন' নাটকের ভূমিকায়। নবান্ন নাটকের শক্তির অন্যতম উৎস 'নিশ্চয়ই বাংলার লোকজীবন, গ্রামীণ জীবন, কৃষকজীবনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাট্যকারের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। 'নীলদর্পণ' নাটকের শক্তির উৎসও ছিল কৃষকজীবনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাট্যকারের ঘনিষ্ঠতা। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী দীনবন্ধু মিত্র নীলকরউৎপীড়িত সংগ্রামী কৃষকজীবনের দুর্দশা, ফসলের কান্না, বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহার 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে নাট্যকারের 'সর্বব্যাপী সহানুভূতি দিয়ে জনজীবনঘনিষ্ঠ নাটক রচনার রাস্তা প্রথম দেখিয়েছেন। সচ্ছল অবস্থার হিন্দু কৃষক নবীন মাধব এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষক তোরাপ একত্রে অত্যাচারী নীলকরের মোকাবিলা করেছেন দারুণ ক্রোধে

আর প্রবল যন্ত্রনায়। ক্ষমতাশালীদের আনুগত্য নয়, মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্ষমতাশালীদের অন্যায়ের প্রতিবাদে নাটকের হাতিয়ার ধরলেন দীনবন্ধু মিত্র। কৃষক জীবন নিয়ে রচিত নীলদর্পণ -এর প্রায় ৮৪ বছর পর কৃষক জীবন নিয়ে নাটক 'নবান্ন' লিখলেন বিজনবাবু। 'নীলদর্পণ' আপাদমস্তক বাস্তববাদী নাটক। 'নবান্ন' অর্ধেক বাস্তব, অর্ধেক কল্পবাস্তব।

বাংলা নাট্যআন্দোলনের পথিকৃৎ 'নবান্ন' নয়। উশিশতকের প্রতিবাদী নাট্যকারগণই বাংলা নাট্যআন্দোলনের পথ নির্মাণ করেছেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংঘবদ্ধ বাধাদান, সন্ত্রস্ত ইংরেজশাসকের নাট্যবিরোধিতা, নাট্যনিয়ন্ত্রণআইন প্রণয়ন, নাট্যকার, থিয়েটারম্যানেজারসহ শিল্পীদের গ্রেপ্তার—এরকম দুস্তর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁরা নাটক রচনা করেছেন। 'নবান্ন' নাটকের বিরোধিতা এসেছে ভিন্ন পথে। প্রধানত বিশশতকের প্রথমভাগের জীবন্মৃত বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের দিক থেকে। তারা নবান্ন নাটকের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের সংকট দেখেছেন। তাদের বিরূপতা এতো তীব্র হয়ে উঠেছিল যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরির মতো অসাধারণ প্রতিভাধর অভিনেতারা 'নবান্ন' নাটকের জন্য পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের দরজা খুলে না দিয়ে বরং বন্ধ করে দিয়েছিলেন। [নীহার দাশগুপ্ত – 'নবান্ন চিন্তা'] তাঁদের এই বিরূপতা 'নবান্ন'র সমাজসচেতন বিষয়বস্তু, জীবনঘনিষ্ঠতা, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তৈরি হয়নি, বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল 'নবান্ন''র সামগ্রিক প্রযোজনায় এক নতুন থিয়েটারের আভির্ভাব থেকে এবং মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাস ও জনাদরের মুখে পেশাদারি, একক অভিনয়কৃতিত্বনির্ভর থিয়েটারের অবসান আশঙ্কা করে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী নবান্ন নাটকের অভিনয় দেখে 'একে ভিখারিদের থিয়েটার' বলে অনাদর করছেন। [গঙ্গা বসু – নবান্নের স্মৃতি – নাটক ও নাট্য আন্দোলন]

তীব্র প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উনিশ শতকের দুঃসাহসী নাট্যকারগণ বাংলা নাট্যআন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে যে যাত্রাপথ সেদিন নির্মাণ করেছেন, ভারতীয়গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটক সে পথকে নতুন যুগের নতুন থিয়েটারের পথ চলার জন্য আরও প্রশস্ত করেছে।

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের প্রতিনিধিত্বও করেছে 'নীলদর্পণ', 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' —উনিশ শতকের পটভূমিতে। কিন্তু এসব নাট্যকারগণ সেদিন কোনো রাজনৈতিক দলের মতানুগামী ছিলেন না। থাকা সম্ভবও ছিল না। মানুষকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, মার্কসীয় মতাদর্শপুষ্ট কোনো সাংস্কৃতিক সংঘ, সংগঠিত কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। সে ইতিহাস পরিকল্পিতভাবে শুরু হয়েছিল বিশশতকের প্রথমভাগে। সামন্তবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের প্রবাহের সঙ্গে কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত নানাস্তরের মানুষের আন্দোলনের যোগসুত্র এই সময়েই রচিত হল। মার্কসীয় মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ বামপন্থী গণমুখী আন্দোলন সূচিত হলো শতকের প্রথমভাগেই। ভারতের কমিউনিস্টপার্টি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লড়াইকে এগিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করল এবং সে কাজে প্রয়াসী হল। কমিউনিস্টপার্টির নেতৃত্বে গঠিত হল 'ভারতীয় গণনাট্যসংঘ'। বিজন ভট্টাচার্য এই সংঘের একজন উদ্যোগী সভ্য এবং রাজনীতিগতভাবে কমিউনিস্টপার্টির মতানুগামী, পার্টির সদস্য এবং পরে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। মার্কসীয় মতবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তংার সৃজনকর্মকে প্রভাবিত করেছে। নিজেই বলেছেন, 'কমিউনিস্ট আন্দোলনে না এলে নাট্যকার হতাম না। আমার পক্ষে নাটক লেখা সম্ভব হতো না।' কমিউনিস্টপার্টি এগিয়ে এল তাঁর 'নবান্ন' নাটককে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। ভারতীয় গণনাট্যসংঘ প্রযোজনা করল, 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'। উনিশ শতকের নাট্যকারদের পক্ষে এরকম কোনো রাজনৈতিক সমর্থনের সুযোগ ছিল না। তাঁরা সমর্থন ও প্রেরণা পেয়েছিলেন বাংলার নবজাগরণে উত্তরণের যুগের সমাজ বিপ্লবীদের কাছ থেকে। উনিশ শতকের প্রতিবাদী নাট্যকারদের নাটকে যে রাজনীতি বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছিল তার উৎস ছিল সুগভীর মানবপ্রেম। মনুষ্যত্বের প্রতি লাঞ্ছনা উৎপীড়ন তাঁদের মধ্যে গভীর বেদনা ও ক্রোধ জাগিয়েছিল। শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণিউৎস, শ্রেণিরূপ, শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম— এসব না জেনেও অসম সাহসে দ্বিধাহীন কণ্ঠে পীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হলেন। সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের পাপকে নির্ভয়ে ধিক্কার জানিয়ে তার বিনিপাত চাইলেন। এই মানবপ্রেম থেকেই তাঁরা সেদিনের সংঘটিত সমাজআন্দোলনে সাহিত্যিকের কাজের একটা অঙ্গ হিসাবে নাটকের হাতিয়ার রচনা করে আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধনঅভিলাষের মধ্যেই উনিশ শতকের প্রতিবাদী নাটকের রাজনীতি। এঁরাই বাংলা রাজনৈতিক নাটকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং বিজন ভট্টাচার্যের এবং বিশশতকের সমাজসচেতন নাট্যকারদের আবির্ভাবের জমি তৈরি করে দিয়েছেন।

'নবান্ন' প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের এতো কথা বলছি এ কারণে যে - খুবই বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকারগুলি যা সমাজ ও সময়ের বদলের মধ্যেও নানাভাবে বর্তমানের সেবা করতে সক্ষম, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে না দেখার, তাদের প্রতি উদাসীন থাকার একটা পরাগত সংস্কৃতি দেশে প্রকট হচ্ছে। মূল্যবান উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা করে আমরা আধুনিক হবার সাধনা করছি। ধ্বনিরে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করছে। উনিশ শতকের যে সব সমাজসচেতন গণমুখী প্রতিবাদী নাটক সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতা ঘোষণা করে বাস্তব সমস্যা চিত্রণের সততায়, নাট্যকারের অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায়, জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে দর্শকের চেতনায় ও মানসইচ্ছায় সাড়া জাগিয়েছিল আর শত্রুর বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল — তাদের সেবকশক্তিকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে। উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকারের সহযোগিতার প্রতি অনাদরের বেদনা লক্ষ্য করেই এসব কথার অবতারণা।

।। দুই।।

'নবান্ন'-র মূল্যায়ন

চিত্তরঞ্জন ঘোষ তাঁর প্রবন্ধ 'নাটক নবান্ন' -এ কমিউনিস্টদের একাংশের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তাঁদের বক্তব্য ছিল, এ নাটকে জনগণের সংগ্রাম তেমন স্থান পায় নি ... তাঁদের অভিযোগ ছিল : আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, যথেষ্ট সংগ্রামী নয়, হতাশা সঞ্চারী ইত্যাদি।' একদিক থেকে এ বক্তব্য ও অভিযোগের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরকে কমিউনিস্টরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন তা হল —ভয়ংকর এই দুর্ভিক্ষের পেছনে যেমন প্রকৃতির মার কাজ করেছে, তারই সঙ্গে রয়েছে ঔপনিবেশিক অপশাসন ও একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী বিবেকহীন লোভী অমানুষের চক্রান্ত। বিজনবাবু নাটকের ভূমিকায় নিজেই সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন— 'সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী পাইকার মহাজন আর কালোবাজারি মজুতদারের দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে।...মাঠের রাজা কৃষককে ভূমিহীন নিরন্ন ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। কুৎসিত শাসন আর নিরঙ্কুশ শোষণের অনিবার্য ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। নেমে এল সারাদেশব্যাপী মহামন্বন্তরের করাল কালো ছায়া।' এই বিশ্লেষণ নিয়ে মন্বন্তরের মর্মভেদী বাস্তবকে বিষয়বস্তু করে যখন কমিউনিস্ট বিজনবাবু নাটক লিখলেন, কমিউনিস্ট কর্মীদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ঠিক ছিল — নাটকে

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম, কৃষক আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। সংগ্রামী কৃষকচরিত্রের প্রতিচ্ছবি পড়বে। সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার হবে। নাটকের সময়কাল পটভূমিনির্বাচনে, ঘটনাবিন্যাসের ঐতিহাসিকতায়, বিষয়বস্তু সংগ্রহে, চরিত্র পরিকল্পনায় আন্দোলনের, শ্রেণিসংগ্রামের সজীব উপাদান ছিল। মজুতদার কালোবাজারির বিরুদ্ধে একটা জাগরণের আবহ ছিল। বিজনবাবু নিজেও চেয়েছিলেন এমন একটা জাগরণ ঘটুন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নবান্ন প্রসঙ্গে' লেখায় লিখেছেন — এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বিজনবাবু তাঁকে বলেন 'আমরা চেয়েছিলাম মজুতদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে একটা জাগরণ ঘটুক।' কিন্তু নাটকে সেরকম কোনো জাগরণ ঘটল না। ভীষণ বাস্তবের মোকাবিলায় জীবনের সংক্ষুব্ধ সংগ্রাম এল না। সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করল না নাটক। সংগ্রামী মানুষের প্রতিচ্ছবি পড়ল না নাটকে। মার্কসবাদ পঠনের গভীরতায় সমাজবিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয় তা হল —শ্রেণিতে মতাদর্শগত লড়াইয়ে শিল্পসাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ কায়েম থাকে যে সমাজব্যবস্থায় তার পরিবর্তন ও শোষণহীন মানবসমাজ প্রবর্তণে লড়াই আন্দোলন সংগ্রামে প্রেরণা দেয় শিল্পসাহিত্য। মানুষকে চেতনায় বিকাশিত ও অনুপ্রাণিত করে শোষণবিরোধী সংগ্রামের ব্যাপ্তির মধ্যে তাদের সমবেত করতে সাহিত্যের শক্তি অপরিসীম। 'কুৎসিত শাসন ও নিরঙ্কুশ শোষণের' যে নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে তার থেকে মুক্তি যে সম্ভব, এই উজ্জ্বল বিশ্বাস তাদের মধ্যে উৎপাদন করতে, তাদের প্রাণে আহ্লাদ আনন্দ শান্তি উৎসবের বাসনা জাগাতে, বাসনাপূরণের পথ দেখাতে এবং শত্রুর প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শিল্পসাহিত্য হল মানুষের ব্যবহারিক ও আত্মিক প্রয়োজন সাধনে এক উজ্জ্বল পরিষেবা। 'নবান্ন' নাটকে সে প্রত্যাশা যথেষ্ট পূরণ হয় নি বলেই নাটক সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অনেকের এই বক্তব্য ও অভিযোগ উঠে এসেছে। নবান্ন নিয়ে অভিযোগকারীরা তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ হতে দেখেছে আরেকজন কমিউনিস্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাত জামাই' গল্পে (১৯৪৮)—কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী চেহারা, সংগ্রামী চরিত্রসৃষ্টি এবং আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। বস্তুত 'হারাণের নাতজামাই','ছোটো বকুলপুরের যাত্রী'-র মতো গল্পে সংগ্রামী মানুষের যে প্রতিচ্ছবি পড়েছে, কৃষকশ্রমিক আন্দোলনে এসব গল্প যেভাবে সহায়তা করেছে 'নবান্ন' -এ সে প্রেরণা অনুপস্থিত। 'নীলদর্পণ' নাটকে অত্যাচারী নালকরসাহেব রোগ উডের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সচ্ছল হিন্দু কৃষক নবীনমাধব আর মুসলমান গরিব কৃষক তোরাপের যে মিলিত ক্রোধ ঘৃণা প্রতিহিংসা তীব্র প্রত্যাঘাতে ফেটে পড়েছে — তা দেশজুড়ে, কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সঞ্চার করেছিল। শত্রুর প্রাণে আতঙ্ক জাগিয়ে ছিল। 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষপীড়িত, জমিচোর হারুদত্তর হাতে অত্যাচারিত মাঠের রাজা কৃষকের তিক্ত ভয়ংকর অভিজ্ঞতা বিস্ফোরণের চেহারা নিতে পারত। সে সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কৃষক জীবনে শোষণ বেদনার কথা, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার, চোরাকারবারীদের নারীদেহ বিপণন, সাধারণ মানুষের মনের গভীর অসন্তোষ, মানুষের যাবতীয় মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ, গ্রাম বাংলার লোকজীবন বাংলা থিয়েটারে উপস্থিত করে 'নবান্ন' এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে ঠিকই। সে নতুনত্ব অসাধারণ মঞ্চপ্রয়োগকৃতিত্বে আর দলগত অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে মানুষের মধ্যে বিপুল উচ্ছ্বাস ও জনাদরও সৃষ্টি করেছে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটক গ্রামীণ জীবনে, কৃষক জীবনে, মধ্যবিত্ত জীবনে সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়নি।

অবশ্যই 'নবান্ন' নাটকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ হয়েছে। বিজনবাবুর সব নাটকেই শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন - যন্ত্রণা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, অবরোধ, আন্দোলন, সংগ্রাম উপস্থিত। ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দরদ এবং তাদের লড়াকু শক্তির ওপর বিশ্বাসের মাটিতে শিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম। নবান্ন নাটকেও সেই মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত গণনাট্যসংঘের ঘোষণা ছিল— ''বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন।' [অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় —বাংলা নাটকের রাজনীতি ও 'নবান্ন'] এই অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেছে 'নবান্ন' নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে। এবং তা ঘটেছে বলেই 'নবান্ন' নাটক নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও এ নাটক বন্ধ করে দেওয়া দূরের কথা কমিউনিস্ট পার্টি এ নাটকের প্রাথমিক সাফল্যের জন সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেছে। 'তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটি নিজ দায়িত্বে 'নবান্ন'-র জন্য ভাড়া করা শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের (বর্তমান বিশ্বরূপ) ৭টি অভিনয় রজনীর টিকিট বিক্রি করে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ করে দেয়—'

[সুধীপ্রধান — 'নবান্ন' ও ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলন] চিত্তরঞ্জন ঘোষ তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি.সি. যোশীর মতামত তুলে লিখেছেন— 'তাঁর মত ছিল, গণনাট্যের আদর্শ যারা মেনে নিয়েছে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। প্রথম দিকে কাজ করতে গিয়ে তাদের ভুল ত্রুটি যদি হয়, তবে তা তারাই কাজ করতে করতে বুঝবে এবং তা সংশোধন করবে। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দিলে তাদের কর্মপ্রেরণা নষ্ট করা হবে।' [নটক 'নবান্ন']

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যেমন 'নবান্ন' প্রযোজনা করেছে, আবার 'নবান্ন' প্রযোজনা দিয়েই গণনাট্য আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছে।

'নবান্ন' নাটকের ৪টি অঙ্কের ১৫টি দৃশ্যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। এ নাটককে বলব তিন প্রতিরোধের কাহিনি। যার প্রথম কাহিনিতে সক্রিয় প্রতিরোধ, দ্বিতীয় কাহিনিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, শেষ কাহিনিতে কল্প প্রতিরোধ রয়েছে।

প্রথম প্রতিরোধের কাহিনি শুরু হয়েছে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ গণঅভ্যুত্থানে পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের বিপ্লবী আবেগ দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ পুলিশ মিলিটারির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রতিরোধ দিয়ে। আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দারের জোয়ান দুই পুত্র শ্রীপতি ভূপতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। সেভাবে প্রাণ দিতে মরিয়াভাবে চাইছে প্রধান সমাদ্দার — শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে জীবনটা না দিতে পারলে প্রধানের শান্তি নেই। প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ক'রে জীবনটা দেবার কাজে তিন মরাই ধানের ক্ষতি সহ্য করা তার কাছে তুচ্ছ। শত্রুর আক্রমণে সে পালাতে জানে না। 'চল তো কুঞ্জ গাঙ বারবার এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের' । কৃষকরমণী পঞ্চাননী 'একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে' মঞ্চে ঢুকছে আর বলছে — 'এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা,' পেছোস নি এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা 'অসম সাহসে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে কৃষকরমণী পুলিশ মিলিটারির গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন আর মুখে বলতে পারছে না, 'তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—'এগিয়ে যা। এগিয়ে যা।'

দ্বিতীয় কাহিনিতে প্রতিরোধ একবার মাত্র জ্বলে উঠেছে। কৃষকের শ্রেণিশত্রু জমিচোর পোদ্দার হারুদত্তের বিরুদ্ধে রাগে যন্ত্রনায় লাঠি তুলে ধরেছে কৃষক কুঞ্জ। যদিও শেষ পর্যন্ত হারুদত্তের লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে কুঞ্জ তার কাছে মাপ চাইতে 'বুকে হেঁটে পা ধরবার জন্য এগিয়ে গেছে।' কিন্তু ভেতরের অসহায়তায় 'অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মতো।' কৃষকের এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ তাদের হাজার দুঃখকষ্ট অনাহার অপমান যন্ত্রণার মধ্যে আর একবারের জন্যও নবান্ন নাটকে দেখা যায় নি।

আমিনপুরের মাঠের রাজা কৃষকরা যখন মন্বন্তরে ভূমিহীন নিরন্ন ভিক্ষু হয়ে কলকাতার অলিগলি রাজপথে ফিরতে লাগল — সে সব দৃশ্যেও প্রতিবাদের কথা এসেছে। প্রতিরোধের ইচ্ছাও ব্যক্ত হয়েছে— কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ। হারু দত্ত, কালোবাজারি মজুতদার কালীধন ধাড়া, তার সরকার রাজীবের বিরুদ্ধে কৃষক নিরঞ্জন প্রতিবাদী হয়ে উঠল— 'গাঁয়ে কি মানুষ ছিল না যে হারু দত্তের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।' স্ত্রী বিনোদিনীর মুখে হারু দত্তের নির্যাতন ও অত্যাচারের কথা শুনে নিরঞ্জন আক্রোশে যন্ত্রণায় হাতের তালুতে ঘুসি চাপছে, অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠছে আর পোদ্দার মজুতদারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের শপথ নিচ্ছে। মজুতদারের সরকার রাজীবকে শাসিয়ে বলছে– 'চেঁচাবেন না শকুনের মতো।' শেষে কালীধন, হারু দত্ত, রাজীবকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে তার প্রতিশোধ যেন কিছুটা মিটিয়েছে। কালোবাজারির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষে বিষিয়ে উঠে প্রতিবাদ করেছে চাল খরিদ্দার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক– 'খুনে যে কোথাকার। তোমায় পুলিশে দেব, দাঁড়াও।' মন্বন্তরের হাহাকারের মধ্যে বিবেকহীন নিষ্ঠুর শহরে একশ্রেণির ভদ্রলোকের চোরাবাজারকে প্রশ্রয় দেবার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত নির্মলবাবু প্রতিবাদ করেছে– 'তা বলে যেটা অন্যায় তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে?' প্রধান সমাদ্দার স্মৃতিভ্রষ্ট হতাশাগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিবাদ প্রতিরোধের ইচ্ছা যে মরে নি– ইঙ্গিতে সংকেতে তা প্রকাশিত ঠিকই। ফটোগ্রাফার যখন ছবি তোলার জন্য প্রধানকে উঠে দাঁড়াতে বলল, প্রধান উঠে দাঁড়িয়ে যেন তার বিপ্লবী আবেগের স্মৃতি খুঁজছে– 'উঠে দাঁড়াব বলছেন!... ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার! কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! এমনি উঠে দাঁড়াব! ... হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে ক'রে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটা।' যে অসন্তোষে সেদিন মানুষের মন বিষিয়ে উঠেছিল সে অসন্তোষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ইচ্ছা নাটকের শহরপটভূমিতে এভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু বিজনবাবু সে অগ্নি স্ফুলিঙ্গভরা অবস্থাকে মানুষের জাগরণ ঘটাতে ব্যবহার করলেন না। তিনি একদিকে চেয়েছেন নাটকের মাধ্যমে মন্বন্তরের মর্মবিদারক বাস্তবকে ও মানুষের মধ্যেকার অসন্তোষকে সাধারণ্যে প্রচার করবার দায়িত্ব পালন করতে, অন্যদিকে অন্তরে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে তিনি এর নিরসনের পথের সন্ধান করেছেন। কৃষকদের কাছে ভবিষ্যৎ মন্বন্তর নিরসনের কী সে পথ? আত্যন্তিক আর্তি, সংবেদনশীল মন, সুগভীর মানবতাবোধ ও উজ্জ্বল জীবনস্বপ্ন থেকে বিজন বাবু নাটকের শেষ কাহিনিতে ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের নিরসনের এক কল্পবাস্তব পথের সন্ধান দিয়েছেন আমিনপুর গ্রামের কৃষকদের। সে পথও 'জোর প্রতিরোধে'র পথ। কিন্তু সে প্রতিরোধ শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে নয়, দুভিক্ষ সৃষ্টিকারী, দুর্ভিক্ষ দমনে ব্যর্থ কোনো অপশাসনের সরকারের আর তার পক্ষপুটছায়ায় পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধেও নয়। সে জোর প্রতিরোধ প্রকৃতির গোলযোগ সৃষ্টির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ। হিন্দু মুসলমান যতেক চাষি দোস্তালি পাতিয়ে, ক্ষুদ্রসঙ্গে স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করে মনের সংশয় কাটিয়ে, অজানা বাধাবিপত্তি গ্রাহ্য না করে, মিলিমিশে একসঙ্গে প্রত্যেকের জমিতে সকলে মিলে গাঁতায় খেটে আর ধর্মগোলা স্থাপন করে প্রকৃতির যমদূতের মারের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ হবে। উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্নের সে ছবি নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি দেখিয়েছেন – সদ্যকাটা ফসলে ভরে গেছে কুঞ্জর ঘরের উঠোনটা। নতুন ধানের মরাই হয়েছে। উজ্জ্বল বিদালোকে কর্মব্যস্ত কৃষক নারীপুরুষ। কৃষক রমণী রাধিকা ধান ঝাড়ছে ধামা ভরতি ক'রে ধান সংগ্রহ করছে। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। অর্ধেক ধামা ধানে ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের উপর প্রায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রাধিকা কুলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে মুখটিপে হাসছে আর ধান ওড়াচ্ছে। আনন্দের আহ্লাদে সবাই মিলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের আস্বাদন পেয়েছে। শুরু হয়েছে স্বর্ণসন্ধ্যায় মরা গাঙের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসব। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা শরীরগুলিতে বিগত আকালের কলঙ্কছাপ নিয়েও অফুরন্ত প্রাণের স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে। গোরুদৌড়, মোরগ লড়াই, লাঠি খেলা – আনন্দের সব আয়োজন পূর্ণ। চাষিমেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে বসে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো সব তৈলাধিক্যে চক্‌চক্ করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ। লাল কৌপিন পরা জোয়ান বৃদ্ধ লাঠিয়ালরা বাজনার তালে তালে লাঠি খেলছে। জনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে কৃষক নেতা দয়াল লালকৌপিন পরে দাঁড়িয়েছে। প্রধান সমাদ্দারও সামিল হয়েছে। উপরে আকাশে ক্রুদ্ধ প্রকতি কত বড়ো একটা গোলযোগের রূপ নিয়ে মেঘের গুরু গুরু শব্দ তুলে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কিন্তু নীচে নতুন 'এট্টা ব্যবস্থা'র জীবনের স্বাদ - পাওয়া মানুষের জোর প্রতিরোধের প্রস্তুতি। এই ব্যবস্থাটা ওলটপালট করে না ফেলে দিয়ে মন্বন্তর আসতে পারবে না।

প্রধান ।। আবার যদি আসে সে মন্বন্তর।

দয়াল ।। ...এট্টা ব্যবস্থার ওলটপালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান। তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

প্রধান ।। দয়াল! [জোরে চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে]

বিজনবাবুর এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের 'এট্টা ব্যবস্থার' স্বপ্নকে মূল্যায়ন করে অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – 'শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন 'নবান্ন' [বাংলা নাটকের রাজনীতি ও নবান্ন] শ্রেণিহীন কমিউনিস্ট সমাজ হল 'সর্বজনীন ভূমি, সর্বজনীন কলকারখানা। সর্বজনীন শ্রম।' উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত এই মানবসমাজে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থাকবে না। মুষ্টিমেয় শোষণকারীর শাসনের পরিবর্তে ব্যাপক সংখ্যাক মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট রূপ লাভ করবে এই শাসনব্যবস্থায়। মানুষের জীবনের সুখশান্তি ভালো থাকা, আনন্দ বাসনা স্বপ্নের যথার্থ সার্থকতা সম্ভব এই শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায়। কিন্তু মানুবসমাজকে পুনর্গঠিত করে তাকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের বন্ধু - হিতকামীদের সমবেত শক্তির লড়াই, আন্দোলন, আর কঠোর কঠিন শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে নয়, মজুতদার জোতদারের বিরুদ্ধে নয়– সে যুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। ভূমিকম্প বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আধিদৈবিক যমদূতের মারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ। 'নবান্ন' নাটকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের সেই প্রতিরোধের স্বপ্ন - কথা শুনিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য।

বিজনবাবুর এই স্বপ্ন দেখা এবং আমিনপুরের কৃষকদের এই স্বপ্ন দেখানো এক মানবপ্রেমিক শিল্পীর সুন্দর আবেগে উজ্জ্বল। প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৬৬ সালে যদুনাথ তর্করত্ন রূপক জাতীয় 'দুর্ভিক্ষ দমন নাটক' লিখেছিলেন। ইংরেজ অপশাসনে সৃষ্ট মর্মভেদী দুর্ভিক্ষের নিরসনের পথ খুঁজতে গিয়ে ভয়ংকর বাস্তবকে তিনি বাস্তবোত্তরে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীদেবীর শরণে সংস্থাপন করলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষকে স্বপ্ন দেখালেন দেবীর দয়ার। মানুষের মিলিত প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দুর্ভিক্ষ নিরসনে লক্ষ্মীদেবী বৃষ্টি আর শস্যসম্ভার নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। শান্তি আনন্দ আহ্লাদে মানুষের জীবন আবার ভরে উঠল। মানবপ্রেমিক এই নাট্যকারের স্বপ্ন ছিল দৈববিশ্বাসজাত এক ভাববাদী স্বপ্ন। দেবীর দয়া দিয়ে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ। কমিউনিস্ট বিজনবাবুর স্বপ্ন ছিল ইউটোপিয় স্বপ্ন – নবান্ন উৎসব দিয়ে প্রকৃতির ভয়ংকর মার-মন্বন্তরের প্রতিরোধ। সমাজরূপান্তরে শ্রেণিসংগ্রামের বিজ্ঞানবর্জিত এক কল্পবাস্তবের স্বপ্ন। কমিউনিস্ট মতাদর্শপুষ্ট কোনো শিল্পী কি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে মনে করবেন যে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে প্রলিতারীয় বিপ্লব বা সর্বহারা

শ্রেণির একনায়তকত্ব প্রতিষ্ঠা না করে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশত্রুদের অত্যাচারের জোয়াল কাঁধ থেকে ঠেলে না সরিয়ে কৃষক সমাজ কেবল গাঁতায় খেটে ধর্মগোলা স্থাপন করে সমাজের সাম্যবাদী পুনর্গঠন ঘটাতে পারে? একথা ঠিক যে মার্কসীয় সাহিত্য বিচারের অন্তর্দৃষ্টি বলবে, –সমাজজীবন ও বিশেষ শ্রেণির মতবাদ সাহিত্যে কখনও কখনও কোনো বাঁধাধরা যান্ত্রিক নিয়মে প্রতিফলিত হয় না। শিল্পী বিশ্বাস করবেন— মহৎ শিল্পকলা নিশ্চয়ই সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়ম মেনেই চলে। বিজনবাবু ভবিষ্যতে শোষণহীন শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু সমাজরূপান্তরের প্রক্রিয়ায় মার্কসীয় চেতনাকে সরিয়ে রেখে। এ দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। মানবসমাজের ইতিহাস যে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণিসংগ্রাম যে সমাজবিকাশের চালিকাশক্তি এবং শ্রেণিসংগ্রামের বিজয়ী হয়েই যে সমাজবিকাশের ধারা ধরে সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে, বিজনবাবু সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। থেকেও উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন দেখার সুতীব্র আবেগে একটা বড়ো উল্লম্ফ দিয়ে 'নবান্ন' নাটককে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন বিলাসের নাটক করে তুলেছেন। বিজনবাবু নিজেই বলেছেন, 'বাস্তববাদী হলেও আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন।' কিন্তু 'নবান্ন' নাটকে বাস্তবতাবাদ ও স্বপ্নকে, 'রুটির লড়াই আর প্রাণের লড়াইকে' এক সূত্রে তিনি বেঁধে দিতে পারেন নি। 'গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল' নিবন্ধে সে দায়বদ্ধতার কথা নিজেই লিখেছিলেন— 'মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মর্মকথা।' কিন্তু প্রাণের স্বপ্নে, কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থার কল্পনায় তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে মার্কসীয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণনাট্যের মর্মকথা বিস্মৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কৃষিচিন্তা, সমবায়নীতি, আত্মশক্তিতত্ত্ব, ধর্মগোলাভাবনা নবান্ন নাটকে বিজনবাবুকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃষিচিন্তার বাস্তবদৃষ্টি তাঁর মধ্যে ছিল না। পরাধীন দেশে কৃষিব্যবস্থায় সরকারের কৃষকবিরোধী নীতির মুখে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কৃষকদের দুরবস্থা মোকাবিলার অন্যতম একটা পথ হলো সমবায় নীতি ধরে চাষের ক্ষেত্রে একত্র হয়ে চাষ করা, আত্মশক্তিতে জাগ্রত হওয়া, ধর্মগোলা স্থাপন করা। আমাদের নিজেদের পল্লীপঞ্চায়েতকে জাগিয়ে তোলা যাতে কৃষক এসবের গুরুত্ব বোঝে। কিন্তু সর্বোপরি জমির স্বত্ব কৃষককে দিতে হবে। কারণ 'জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়। তা চাষির।' জমি রক্ষা করতে কৃষক নিজে সচেতন হবে এবং তাকে সাহায্য করবে সরকারি ব্যবস্থা। কিন্তু পরাধীন দেশে ব্রিটিশ সরকারের কৃষকবিরোধী নীতিতে তা সম্ভব নয় দেখে রবীন্দ্রনাথ অন্তরে ব্যথিত হয়েছেন। বিজনবাবুর কৃষকের আত্মশক্তির জাগরণ, ধর্মগোলাস্থাপন অন্য পথের যাত্রী।

দুর্ভিক্ষের নিদারুণ বাস্তবকে এবং দুর্ভিক্ষ নিরসনের বাসনাকে বিজন ভট্টাচার্য উজ্জ্বলজীবনের বাস্তবোত্তরের স্বপ্নে সংস্থাপন করতে গিয়ে নাটকের রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে বিক্ষিপ্ত ও দিকভ্রষ্ট করেছেন। এবং সে কারণেই প্রশ্ন উঠেছে — নবান্ন যথেষ্ট সংগ্রামী নয়, আন্দোলন সম্পর্ক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, হতাশাসঞ্চারী ইত্যাদি। গণনাট্যের সঙ্গে মতাদর্শকারণে নবান্ন প্রযোজনার চার বছরের মধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণনাট্যের সংস্রব তিনি ত্যাগ করলেন। আন্দোলন বিমুখতা, বিশুদ্ধ শিল্পচিন্তা একধরনের শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতা ও হতাশার ছায়া তাঁর মধ্যে পড়েছিল।

এসব সত্ত্বেও গণনাট্য আন্দোলনের এবং দেশের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস বিজনবাবুর নাম এবং তাঁর 'নবান্ন' প্রমুখ নাটক উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকারের সহযোগিতার অস্বীকৃত তার ঐতিহাসিকতার প্রতি ঘোর অবিচার। বিজনবাবু ও তাঁর নাটক সে বুদ্ধিহীন অবিচারের শিকার হবে না কখনওই।

'নবান্ন' নাটকের ষাট বছর (প্রথম অভিনয় ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪, শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চ) নাটকখানি নিয়ে একটি প্রবন্ধের মুসাবিদা করেছিলাম। সেটি আর প্রবন্ধ হয়ে ওঠেনি। এখন 'নাট্যকথা'-র সম্পাদক সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জির অনুরোধ পীড়াপীড়িতে খসড়াটির প্রবন্ধ রূপ দিলাম।